Paper Title - Philosophy of Religion

Session - 2022-23

Semester - V

(১) ধর্মের স্বরূপ ও সংজ্ঞা : (5)

মনুষ্যচিন্তার বিবর্তনের ইতিহাসে ধর্মের স্থান অতিগুরুত্বপূর্ণ। প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে ধর্ম মানুষের জীবনে কেন্দ্রীয় স্থান অধিকার করে আছে। মানুষের ইতিহাসে ধর্মের প্রকাশ ঘটেছে নানা ও বিচিত্র ভাবে যার মধ্যে কিছু বৈচিত্র স্থূল, অসাড় বা তুচ্ছ, এবং নিন্দাজনক তেমনি আবার কিছু বৈশিষ্ট্য আদর্শমূলক, মহান এবং কল্যাণজনক। ধর্ম কোনো এক বিশেষ কাল ধরে স্থায়ী হয়ে থাকেনি, মানুষের চিন্তার স্রোতের সাথে ধর্ম বিভিন্ন খাতে প্রবাহিত হয়েছে, ধর্মের এই প্রবাহমানতা বৈশিষ্ট্যটি লক্ষ করে একাদশ শতাব্দীর খ্রিস্টিয় ধর্মজাযক অ্যান্সেলম্ ধর্ম এবং ঈশ্বর সম্পর্কে যে সংজ্ঞা দিয়েছিলেন তা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। ধর্ম সম্পর্কে অ্যান্সেলম্ বলেছেন - "ধর্ম হল বুদ্ধির বিকাশ," এবং ঈশ্বর সম্পর্কে বলেছেন - "ঈশ্বর হল সেই সত্ত্বা যার থেকে বৃহত্তর সত্ত্বা অচিন্তনীয়।"

- অধ্যাপক টাইলর তাঁর "Primitive Culture" গ্রন্থে ধর্ম প্রসঙ্গে বলেছেন, 'ধর্ম হল এক বা একাধিক আধ্যাত্মিক সত্ত্বার বিশ্বাস। জার্মান পন্ডিত Max Muller বলেছেন, "ধর্ম হল এমন এক প্রকার মানুষবৃত্তি বা মানসিক প্রবনতা যা অসীমকে উপলব্ধি করার জন্য মানুষকে উদ্বুদ্ধ ও সাহায্য করে।

- ধর্ম সম্পর্কে অধ্যাপক মেনজিস তাঁর 'History of Religion" গ্রন্থে যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তা হল, " ধর্ম হল কোন প্রয়োজনবোধের আধ্যাত্মিক সত্তার উপাসনা।"

বিভিন্ন ধর্মের ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্যকে ধর্মের বৈশিষ্ট্য রূপেই গন্য করা হয়েছে। প্রসঙ্গত জার্মান দার্শনিক Wittgenstein প্রদত্ত খেলা সাদৃশ্যের উল্লেখ করে বিষয়টিকে বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে। যেমন বিভিন্ন ধরনের খেলাকে পর্যবেক্ষণ করলে এমন কোন বৈশিষ্ট্য পাওয়া যাবেনা যা প্রত্যেকটি খেলাতেই সাধারণ

ভাবে উপস্থিত, যা পাওয়া যায় তা হল কয়েকটি বিষয়ে মিল বা সাদৃশ্য যাদেরকে Wittgenstein পারিবারিক সাদৃশ্য বলেছেন। যেমন একটি খেলার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য পর্যবেক্ষণ করার পর যখন অন্য একটি খেলায় বিশ্লেষণ করা হয় তখন দেখা যায় যে প্রথম খেলাটির কিছু বৈশিষ্ট্য দ্বিতীয়-টিতে থাকলেও অনেক বৈশিষ্ট্য অপসারিত হয়েছে এবং নতুন কিছু বৈশিষ্ট্য যুক্ত হয়েছে। তেমনই বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে কোন সাধারন বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা যায়না বলেই ধর্মের সঠিক ভাবে কোন একটি সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব নয়। বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে পারিবারিক সাদৃশ্যের উল্লেখ করেই তাদের প্রত্যেককে ধর্ম নামে চিহ্নিত করা হয়।

তবে ধর্মের সঠিক সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব না হলেও ধর্মের স্বরূপকে বোঝার জন্য ধর্মচেতনার সঠিক উপলব্ধির জন্য অধ্যাপক গ্যালোয়ে তার 'ধর্মদর্শন' গ্রন্থে ধর্মের একটি আপাতগ্রহনযোগ্য সংজ্ঞা দিয়েছেন। তা হল – 'ধর্ম হল অতিপ্রাকৃত শক্তিতে মানুষের আস্থা ও বিশ্বাস যার দ্বারা মানুষ তার আবেগমূলক অনুভূতি গুলিকে তৃপ্ত করে এবং জীবনের স্থায়ীত্ব কামনা করে এবং সে তার আবেগমূলক অনুভূতি গুলিকে পূজা আরাধনা ইত্যাদির ক্রিয়ার মাধ্যমে প্রকাশ করে।

এই সংজ্ঞাটিতে মানুষের মনের তিনটি বৃত্তির তথা – (i) জ্ঞানাত্মক, (ii) অনুভূতিমূলক এবং (iii) কর্মমূলক বৃত্তির উল্লেখ আছে। মানুষের জীবনের সর্ব ব্যাপারেই মনের এই তিনটি বৃত্তি অল্পবিস্তর উপস্থিত থাকে, অর্থাৎ সব ক্ষেত্রেই মন সামগ্রিক ভাবে কাজ করে, ধর্মের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয় না। অতিপ্রাকৃত শক্তিতে বিশ্বাস হল জ্ঞানাত্মক দিক। আবার এই জ্ঞান বা অনুভূতিগুলোকে প্রকাশ করা হয় ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান, পূজা-অর্চনার মাধ্যমে, সুতরাং মানুষের ধর্ম তথা ধর্মচেতনা একই সঙ্গে জ্ঞানাত্মক, অনুভূতিমূলক ও কর্মমূলক।

উপরিউক্ত তিনটি সংজ্ঞাই একদেশদর্শিতা দোষে দুষ্ট। অন্যান্য অভিজ্ঞতার মতো ধর্মীয় অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রেও আমাদের মন সামগ্রিক রূপে কাজ করে, বিশেষ কোনো এক বৃত্তি হিসেবে নয়। মানবচেতনায় জ্ঞান, অনুভূতি ও ইচ্ছা (কর্ম) বিশ্লিষ্ট অবস্থায় থাকে না। একের সঙ্গে অন্যটি মিশ্রিত অবস্থায় থাকে। যেমন আমাদের বিজ্ঞান জ্ঞানের সাথে অনুভূতি মিশ্রিত থাকে, সেই আবেগ মিশ্রিত অনুভূতি আবার ক্রিয়া কর্মের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে। কাজেই পরিশেষে, অধ্যাপক গ্যালোয়ে ধর্মের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন যে, "ধর্ম হল অতিপ্রাকৃত শক্তির ওপর মানুষের আস্থা ও বিশ্বাস যারা দ্বারা মানুষ তার আবেগমূলক অনুভূতিকে তৃপ্ত করতে চায় এবং জীবনের স্থায়ীত্ব কামনা করে এবং সে আবেগ ও অনুভূতি গুলিকে প্রার্থনা-আরাধনা ইত্যাদি ক্রিয়ার মাধ্যমে প্রকাশ করে।

(2) যাদু ও ধর্ম :—

Q: ধর্ম ও যাদুবিদ্যার সম্বন্ধ প্রসঙ্গে বিভিন্ন মত কী কী? কোন মত তুমি সমর্থন করো?

OR

যাদুবিদ্যা ও ধর্মের মধ্যে পার্থক্য আলোচনা করো। (15)

Ans: যাদু ও ধর্মের মধ্যে পার্থক্য দুইভাবে আলোচনা করা যায় —

(a) যাদু ও ধর্মের মধ্যে মিল ও অমিলের সম্পর্ক,

(b) যাদু ও ধর্মের মধ্যে বৈপরীত্য সম্পর্ক,

(a) যাদু ও ধর্মের অমিলের সম্পর্ক :

মানুষের ইতিহাসের সূচনাপর্বে দেখা যায় যে ধর্মের সাথে যাদু আবার যাদুর সাথে ধর্ম মিশ্রিত। এর থেকে অনুমান করা হয় যে যাদু ও ধর্ম যদিও পরস্পর পরস্পরের থেকে অভিন্ন তথাপি তাদের উৎস-মূল অভিন্ন। ধর্ম হল অতিপ্রাকৃত শক্তিতে মানুষের এমন এক আস্থা বা বিশ্বাস যার দ্বারা সে তার আবেগমূলক অনুভূতিকে তৃপ্ত করতে চায় এবং জীবনের স্থায়ীত্ব কামনা করে এবং সে আবেগ ও অনুভূতিকে পূজা-আরাধনা ইত্যাদি ক্রিয়ার মাধ্যমে প্রকাশ করে।

আর যাদু হল এমন এক অপরিহার্য শক্তিতে

বিশ্বাস যাকে মানুষ তার রহস্যময় বিদ্যার মাধ্যমে (পূজা অর্চনার মাধ্যমে নয়) কাজে লাগাতে চায়।

যাদু ও ধর্মের মধ্যে দুটি উল্লেখযোগ্য বিষয়ে সাদৃশ্য আছে। যথা— (i) দুটি ক্ষেত্রেই মানুষ এক অতিপ্রাকৃত বা অপার্থিব শক্তি বা আত্মায় বিশ্বাস স্থাপন করে,

(ii) দুটি ক্ষেত্রেই মানুষ ওই শক্তি বা সত্ত্বাকে নিজের প্রয়োজনে কাজে লাগাতে চায়।

তবে এই দুটি বিষয়ে সাদৃশ্য থাকলেও অনেক বিষয়ে বৈসাদৃশ্য আছে, যথা —

(i) যাদু ও ধর্মের মধ্যে প্রধান পার্থক্য হল মনোভাবগত পার্থক্য ধর্মীয় মনোভাব হলো বিনম্র ও বিনীত মনোভাব, আর রহস্যময় শক্তির কাছে ~~পার্থক্য হল~~ ~~আত্ম~~ মনোভাব হল আত্মসমর্পণের মনোভাব।

(ii) অধ্যাপক গ্যালোয়ে ধর্ম ও যাদুর পার্থক্য করতে গিয়ে বলেছেন, — 'ধর্মের মনোভাব হল সমর্পণের এবং যাদুর মনোভাব হল ~~ক~~ কর্তৃত্বের।' ধর্ম গুরুত্ব দেয় ঈশ্বরে বিশ্বাসকে, আর যাদু গুরুত্ব দেয় আত্মদম্ভ কে, ধর্মীয় পূজা উপাসনা ইত্যাদির মাধ্যমে মানুষের বিনম্র ও বিনত মনোভাবই প্রকাশ পায়, আর যাদুতে যে মনোভাব প্রকাশ পায় তা ঔদ্ধত্য ও কর্তৃত্বস্বরূপ মনোভাব, আদিবাসী যাদুকর বিশ্বাস করে সে এমনই শক্তিধর যে অলৌকিক শক্তি ও তার কাছে বশীভূত। একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে ব্যাপারটি বোঝানো হলো। — আদিম যাদু বিদ্যায় কার্যকারণ নিয়ম অনুসরণ করার পরিবর্তে অনুষঙ্গ নিয়ম, অর্থাৎ কখনও সাদৃশ্য নিয়ম আবার কখনও নৈকট্য নিয়ম অনুসৃত হয়, শত্রুনিধন কাম্য হলে ~~কখ~~ যাদুকর গোষ্ঠীর সদস্যদের শত্রুর সাদৃশ্য একটি মূর্তি গড়তে নির্দেশ দেন এবং বলেন ওই মূর্তির ক্ষতিসাধন করলে শত্রুর দেহেরও ক্ষতিসাধন হবে, যাদু এখানে সাদৃশ্য নিয়ম অনুসরণ করে। অর্থাৎ ধর্মের মনোভাবটি হল বিনম্র মনোভাব আর যাদুর মনোভাব হল ঔদ্ধত্যের মনোভাব।

(ii) দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বৈসাদৃশ্য হল যাদু যে শক্তিকে বলপূর্বক নিয়ন্ত্রণ করতে চায় তা মূলত নামহীন ও অনৈতিক কিন্তু ধর্ম জগতের মূল শক্তিকে এক গুণবান ব্যক্তি রূপে গণ্য করে

শ্রদ্ধা, ভক্তি ও বিনম্র আত্মসমর্পণের মাধ্যমে মানুষ তার অভীষ্ট লাভ করতে পারে, যাদুকর যে রহস্যময় অপার্থিব শক্তিতে বিশ্বাসী ~~করতে চায়~~ এবং যাকে সে নিজস্বার্থসিদ্ধির জন্য বশীভূত করতে চায়, ও সেই অপার্থিব শক্তি নামহীন যার কোন প্রতিরূপ গঠন করা সম্ভব নয় এবং যার প্রতি ভালো-মন্দ জাতীয় নৈতিক গুণাগুণ ও প্রয়োগ করা যায় না।

কিন্তু ধর্মের ক্ষেত্রে ওই অপার্থিব শক্তি বা সত্ত্বাকে ব্যক্তিত্বসম্পন্ন দেবদেবী রূপে কল্পনা করা হয় এবং সেই শক্তির কাছে বিনম্র ভাবে প্রার্থনা করলে অভিষ্ট লাভ করা যায়।

(iii) তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য হল যাদু ব্যক্তিকেন্দ্রিক, অসামাজিক এবং ক্ষেত্রবিশেষে সমাজবিরোধী, কিন্তু ধর্ম এক সামাজিক ব্যাপার, ধর্মের মাধ্যমে সামাজিক সংগতি ও ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়, ধর্মীয় পালাপার্বণে বা উৎসবে গোষ্ঠীর অন্তর্গত সমস্ত অথবা অধিকাংশ মানুষ ধর্মস্থানে সমবেত হয়, প্রার্থনা করে, কিন্তু যাদুর ক্ষেত্রে এমন কোন জনসমাবেশের অবকাশ নেই, যাদু শক্তিকে কেবল যাদুকরই, প্রয়োগ করতে পারে, সমবেত ভাবে শক্তির প্রয়োগের কোন অবকাশ নেই, যাদুও ধর্মের এই পার্থক্যকে দুরখেইম বলেছেন, যাদুর কোন ধর্মস্থান অর্থাৎ মন্দির নেই কিন্তু মন্দিরের সঙ্গে ধর্মের অচ্ছেদ্য সম্পর্ক আছে।

(iv) চতুর্থ গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য হল যাদু এক গুপ্তবিদ্যা বা গুরুবিদ্যা, যাদুকর তাই এই গুপ্তবিদ্যাকে একান্ত ব্যক্তিগত ও গোপনীয় রূপে সংরক্ষিত করে, তাদের কাছে এই বিদ্যা কখনই প্রকাশ করেনা, এজন্যই দেখায় বিশেষ কোনো যাদুকরের মৃত্যুর পর তার যাদুরও অবসান ঘটে, কিন্তু ধর্ম সামাজিক হওয়ায় ধর্মের মধ্যে গোপনীয় কিছু নেই, ধর্মীয় শিক্ষার মাধ্যমে সূত্র উপাসনা, উৎসর্গ ইত্যাদি সম্পর্কে মানুষকে অবহিত করা হয়।

(b) <u>ধর্ম আগে না যাদু আগে?</u>—

ধর্ম ও যাদুর উৎসমূল অভিন্ন, জাদুর অন্তরালবর্তী এক রহস্যময় অতিমানবীয় শক্তির উপলব্ধি থেকে ধর্মের উৎপত্তি হয়েছে আবার যাদুরও উৎপত্তি হয়েছে, কিন্তু উৎসমূল অভিন্ন হলে প্রশ্ন হবে কালের দিক থেকে কোনটি আগে ও কোনটি পরে? অর্থাৎ—

(I) ধর্ম যাদুপূর্ব, (II) যাদু ধর্মপূর্ব এবং (III) ধর্ম ও যাদুর উৎস-মূল অভিন্ন এবং তারা সমকালীন।

(I) ধর্মের উৎপত্তি হয়েছে যাদুর আগে, অর্থাৎ ধর্ম যাদুপূর্ব :

এই মতের প্রধান পৃষ্ঠপোষক হলেন ড. জেভন্স্। জেভন্স্ বলেন অপার্থিব সত্ত্বায় বিশ্বাস = ধর্ম যাদুতে বিশ্বাসের পূর্ববর্তী। বিবর্তনের ধারায় ধর্মের অবনয়নের ফলে যাদুর উৎপত্তি হয়েছে। ধর্মের অর্থাৎ যাদু হল ধর্মের অবনয়ন বা অধঃপতন। ধর্মের উৎপত্তিলগ্নে ধর্ম ছিল বিশুদ্ধ ও পবিত্র। কিন্তু কালক্রমে নানা অনাচার ও কুসংস্কার যুক্ত হয়ে তা বিকৃত আকারে যাদুতে পরিনত হয়েছে। অর্থাৎ যাদু হল বিকৃত ধর্ম।

—আদিম মানুষের প্রধান লক্ষ্য ছিল ঐহিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ লাভ, খাদ্য-সংগ্রহ ও বাসস্থান লাভ। জগৎব্যাপী অপার্থিব শক্তিকে উপলব্ধি করার পর মানুষ তাকে জীবনযুদ্ধে সহায়ক শক্তিরূপে লাভ করতে চায়। সে জন্য বিনম্র প্রার্থনার মাধ্যমে তাকে তুষ্ট করতে চায়, কিন্তু সর্বদা বিনম্র পূজা-উপাসনার দ্বারা অভিষ্ট লাভ না হওয়ার কারণে সেই শক্তিকে বশীভূত করতে হবে— এই মনোভাব থেকেই যাদুর উৎপত্তি হয়। অর্থাৎ ধর্মের ব্যর্থতাজনিত বিকৃতি থেকেই কালক্রমে যাদুর উদ্ভব ঘটে।

সমালোচনা :

ড. জেভন্স্-এর এই মত গ্রহণযোগ্য নয়, অর্থাৎ যুক্তিসম্মত ভাবে এমন বলা যায়না যে ধর্মের অবনয়নের ফলে সেই বিকৃত কুসংস্কারাচ্ছন্ন যা ধর্ম থেকেই যাদুর উদ্ভব হয়েছে।

সমালোচক গণ বলেন ড. জেভন্স্ তার 'An Introduction to the History of Religion' গ্রন্থে বলেছেন, যাদু ও ধর্মের উৎসমূল ভিন্ন ভিন্ন এবং তাদের মধ্যে যে সম্পর্ক তা নিত্য বিরোধিতার সম্পর্ক। তার এই মত গ্রহণ করলে এটা বলা যাবেনা যে ধর্মের অবনয়নের ফলে যাদুর উৎপত্তি হয়েছে, কারণ সমালোচকদের মতে দুটি বিষয় সম্পূর্ণ বিরোধী স্বভাবের হলে তাদের একটি কখনও অন্যটির থেকে উদ্ভূত হতে পারে না।

(II) যাদুর উৎপত্তি হয়েছে ধর্মের আগে, অর্থাৎ যাদু ধর্মপূর্ব :-

অনেকের মতে যাদুর উৎপত্তিকাল ধর্মের উৎপত্তির আগে, মানুষের

মনের বিবর্তনের কোন এক পর্যায়ে যাদু থেকে ধর্মের উৎপত্তি হয়েছে। এই মতের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ড. ফ্রেজার তার নৃতাত্ত্বিক গবেষণা তত্ত্ব সুবিখ্যাত গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে বলেছেন যাদুর ব্যর্থতা থেকেই ধর্মের উৎপত্তি হয়, আদিম মানুষের অনুন্নত বুদ্ধিতে অনুষঙ্গের সাদৃশ্য নিয়ম ও নৈকট্য নিয়মের অপপ্রয়োগের ফলে যাদুর উৎপত্তি হয়। কিন্তু যাদুর ব্যর্থতার অভিজ্ঞতার ফলে মানুষ ক্রমশই উপলব্ধি করে যে যাদুর উদ্দেশ্যের মাধ্যমে অতিপ্রাকৃত শক্তিকে বশীভূত করে অভীষ্ট লাভ করা যায় না। মানুষ তখন তার মনোভাব পরিবর্তিত করে বিনম্র ভাবে সেই শক্তির কাছে তার কাম্য বস্তু প্রার্থনা করে এবং সেই শক্তিকে দেবদেবী রূপে কল্পনা করে তাদের পূজা ও উপাসনা করে। এইভাবেই যাদুর ব্যর্থতার অভিজ্ঞতা থেকে কালক্রমে ধর্মের উদ্ভব হয়। ফ্রেজারের অভিমত হল ধর্মের উৎপত্তির ক্ষেত্রে যাদুর অবদান ইতিমূলক নয় নেতিমূলক। অর্থাৎ আদিম মানব সমাজে যাদুর প্রাধান্য থাকলেও ক্রমশ তা অকেজো হওয়ায় অর্থাৎ ফলপ্রসূ না হওয়ায় (নেতিমূলক) হলো মানুষের মনে ধর্মের ভাব (বিনম্রতা) জাগ্রত হয়, ~~অর্থাৎ এক কথায়,~~ এবং ধর্মের উৎপত্তি হয়, আর কথা হল যাদুর প্রতি ~~ধর্মের~~ মানুষের হতাশা বোধ থেকেই অর্থাৎ নেতিমূলক প্রভাব থেকেই ধর্মের উৎপত্তি হয়েছে।

<u>সমালোচনা:</u>

ফ্রেজারের মতবাদটি একটি মূল্যবান ইঙ্গিতসূচক মতবাদ হলেও ত্রুটিহীন নয়, কারণ —

প্রথমত; আদিম মানুষকে তিনি যেভাবে উপস্থাপিত করেছেন তা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না, আদিতে মানুষ তার অ যাদুর ক্ষেত্রে অনুষঙ্গ নিয়ম দ্বারা পরিচালিত হয়েছে, একথা বললে আদিম মানুষকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মানুষের মতো বিচারশীল জীব রূপে গণ্য করতে হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর মানুষ দার্শনিক ও মনোবিদরাই প্রথম অনুষঙ্গ নিয়মের কথা বলেছেন। কিন্তু বাস্তবিক ভাবে আদিম মানুষ তার যাদুবিদ্যায় অনুষঙ্গ নিয়ম অনুসরণ করলেও তাকে সচেতন ভাবে বুদ্ধি বিচার বিশ্লেষণ পূর্বক ব্যবহার করেননি, ব্যবহার করেছেন সহজাত প্রবৃত্তির অন্ধ তাড়নার আবেগ বশত, আসলে আদিম মানুষের জীবনের মূল চালিকাশক্তি হল আবেগ ও অনুভূতি, বুদ্ধি বিচার নয়।

দ্বিতীয়ত, আদিতে যাদু ও ধর্মের প্রসঙ্গে মনোভাবগত পার্থক্যের উল্লেখ করলেও ফ্রেজার তার মতবাদকে দোষদুষ্ট করেছেন। যাদু ও ধর্মের ক্ষেত্রে মনোভাবগত পার্থক্য স্বীকার করা হলেও, এমন স্বীকার করা যায়না যে আদিম মানুষ তার অনুন্নত বোধশক্তিতে সেই পার্থক্য অনুভব করতে সমর্থ হয়েছে। ঔদ্ধত্য মনোভাবের প্রকাশ ঘটলে তা যাদু আর বিনম্র মনোভাবের প্রকাশ ঘটলে তা ধর্ম এমন উপলব্ধি উন্নতবোধ সম্পন্ন মানুষের পক্ষেই সম্ভব, বলাবাহুল্য এমন মনে করা সঙ্গত যে আদিম মানুষের জীবনে যাদু ও ধর্মের নির্দিষ্ট স্থান থাকলেও তারা তাদের মধ্যে সঠিক ভাবে কোন পার্থক্য নিরূপন করতে পারেন নি।

(iii) যাদু ও ধর্মের উৎসমূল অভিন্ন:

এই মত অনুসারে যাদু ও ধর্ম সমকালীন এবং তাদের উৎসমূল অভিন্ন। মায়েল এতওয়ার্টস, এই এই অভিমতটি সমর্থন করে বলেন, যাদু ও ধর্মের উৎপত্তি প্রসঙ্গে এই অভিমত হলো সর্বাপেক্ষা নির্দোষ। এই মতে, বিশ্বজগতির রহস্যময় শক্তি সম্পর্কে আদিম মানুষের ভয়-বিস্ময় জড়িত অভিজ্ঞতাই যাদু ও ধর্মের উৎসমূল।

আদিতে যাদু ও ধর্মের মধ্যে মানুষ কোন পার্থক্য অনুভব করেনি। সভ্য মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিতেই যাদু ও ধর্ম পরস্পর বিরোধি:

(১) ধর্মীয় মনোভাব রহস্যময় শক্তির কাছে আত্মসমর্পনের মনোভাব আর যাদুর মনোভাব অহমিকা বা ~~আত্ম~~ আত্মদম্ভ উদ্ধত মনোভাব,

(২) প্রার্থনা, উপাসনা, আত্মনিবেদন ইত্যাদি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ধর্ম রহস্যময় শক্তিকে তুষ্ট করে তার সাহায্য প্রার্থনা করে, আর যাদুবল প্রয়োগের মাধ্যমে সেই শক্তিকে কাজে লাগাতে চায়,

(৩) ধর্ম যে রহস্যময় শক্তির কাছে প্রার্থনা জানায় তা ব্যক্তিসম্পন্ন গুণবান কোন পুরুষ, যেমন যথা- দেবদেবী আর যাদু দর্পিতভাবে কোন শক্তিকে কবলিত করতে চায় তা অলৌকিক, অনামী, নৈর্ব্যক্তিক শক্তি,

5) দুর্খেইম কীভাবে তার সমাজতন্ত্র মতবাদে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন তা আলোচনা করো।

Ans: ন্যায়পন্থী সমাজবাদীগণ, প্রত্যক্ষবাদী, নাস্তিকবাদী সকলেই মানেন যে মানুষের ধর্ম আছে, ধর্মীয় ভাব আছে, এবং ধর্মীয় মানুষের ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাস আছে। তারা মুখে একথাই বলেন যে এইসব ভাব বা বিশ্বাসের ব্যাখ্যার জন্যই অতি প্রাকৃত ঈশ্বর স্বীকৃতির প্রয়োজন হয়। প্রাকৃত সমাজের নিয়মেই

তাদের ব্যাখ্যা সম্ভব কিন্তু শতাব্দির ফরাসি সমাজতাত্ত্বিক ~~এমিল~~ এমিল দুরখেইম ~~ধর্ম ধর্মের~~ ধর্ম তথা ধর্মের ঈশ্বরের প্রসঙ্গে এমন ব্যাখ্যাই দিয়েছেন।

দুরখেইম এর মতে ধর্মের ঈশ্বর, মানুষ যাকে পূজা অর্চনা করে, তা হল মানুষের ~~অচেতন~~ অবচেতনে এক কল্পিত সত্ত্বা যে সত্ত্বাকে ~~কাজে লাগিয়ে~~ হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে সমাজ তার অন্তর্গত ব্যক্তিবর্গকে অনুগত করে তার আচরনকে নিয়ন্ত্রিত করে। ধর্মীয় ভাবনায় মানুষ যখন অতিমানবিক শক্তিকে চারপাশে অনুভব করে তার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনকে অত্যাবশ্যকীয় রূপে গ্রহন করে তখন আসলে সে তার চারপাশের সমাজের অনমনীয় শক্তিকে অনুভব করে এবং তার প্রতি শ্রদ্ধা-বিস্ময় জনিত আনুগত্য জ্ঞাপন করে। সুতরাং ধর্মের ঈশ্বর কোনো অতিপ্রাকৃতিক সত্ত্বা নয়, তা হল চারপাশের প্রাকৃতিক পরিবেশ সমাজ। দুরখেইম এর মতে ঈশ্বর কল্পনা মানুষের এক আত্মকল্পনা মাত্র, ঈশ্বর আসলে সমাজের প্রতীক স্বরূপে এক শক্তি অর্থাৎ সমাজশক্তি, বস্তুতই ধর্মের ঈশ্বর আসলে সমাজশক্তির প্রতীক।

ধর্মের ঈশ্বর যা প্রতীকায়িত করে তা আসলে গোষ্ঠী সমাজের রীতি-নীতি, আচার-প্রথা ইত্যাদি, একদিকে গোষ্ঠী সমাজভুক্ত মানুষের আসল ঈশ্বর হল সমাজই, যে রহস্যময় শক্তিতে সে ঈশ্বর জ্ঞানের পূজো করে চলছে আসলে তা হল অপ্রতিরুদ্ধ সমাজ শক্তি। বিশেষ করে অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের গোষ্ঠী সমাজকে আলোচ্য বিষয় করে দুরখেইম এমন অভিমত প্রকাশ করেছেন। গোষ্ঠীর আকার অতিক্ষুদ্র কারন অল্পকিছু সংখ্যক ব্যক্তিকে নিয়ে হয় এক একটি গোষ্ঠী। এই প্রকার গোষ্ঠীসমাজে সমাজটাই মুখ্য। ব্যক্তি সেখানে গৌণ, ব্যক্তির কোনো স্বাতন্ত্র্য নেই, ~~স্বাধী~~ স্বাধীন ইচ্ছা নেই, সমাজের ইচ্ছাই হল ব্যক্তির ইচ্ছা, গোষ্ঠীসমষ্টি জীবনযাত্রাই ব্যক্তির জীবনযাত্রা। এই কারনে ফ্রয়েড তার সুবিখ্যাত "~~Totem~~ Totem and Taboo"

প্রকে বলেছেন, ব্যক্তির প্রতি গোষ্ঠী সমাজের অপ্রতিরুদ্ধ অনুশাসনের একাধিক দৃষ্টান্ত দিয়েছেন যেখানে গোষ্ঠী সম্মত বিধিগুলিকে অনুসরণ করতে ব্যক্তি বাধ্য থাকে এবং গোষ্ঠী সম্মত নিষেধ গুলিকে অনুসরণ না করতেও ব্যক্তি বাধ্য থাকে, যেমন— কিছু কিছু উপজাতি সমাজে মাতা ও পুত্রের মধ্যে এবং ভ্রাতা ও ভগিনীর মধ্যে যৌন আকাঙ্ক্ষাকে প্রতিরোধ করার জন্য কতগুলি অবশ্যপালনীয় বিধি ও নিষেধের প্রচলন আছে। যেমন - কৈশোর সমাগমের পুত্র সন্তানকে গৃহে লালনপালন নিষিদ্ধ, তাদের লালন-পালন ও ভরণ-পোষণের জন্য পরিচর্যাকেন্দ্রে প্রেরণ করতে হবে। আবার কৈশোর অতিক্রান্ত হলে ভ্রাতার সাথে ভগিনীর সাক্ষাৎও নিষিদ্ধ। এইসব নিষেধ অমান্য করলে সমাজ ব্যক্তিকে কঠোর শাস্তি দেয়। সেই শাস্তি মৃত্যুদণ্ডও হতে পারে।

এইসব দৃষ্টান্ত থেকে এটাই প্রতিপন্ন হয় যে আদিবাসী গোষ্ঠী-সমাজে সমাজ তার অপ্রতিরুদ্ধ রহস্যময় শক্তি দ্বারা ব্যক্তির জীবনকে সর্বব্যাপারে নিয়ন্ত্রণ করে, অর্থাৎ আদিম মানবসমাজে সমাজ ও সমাজশক্তিই সব, সমাজ অতিরিক্ত ভাবে ব্যক্তির কোন অস্তিত্ব নেই।

সমাজের এই সর্বময় প্রভুত্বশক্তির সঙ্গে মানুষ ক্রমশই ন্যায় পরায়ণতা, পবিত্রতা ইত্যাদি মানবিক গুণ যুক্ত করে মনে করে যে সমাজশক্তি অপ্রতিরুদ্ধ হলেও তা ব্যক্তির জীবনে মঙ্গল প্রদায়ক। মানুষ মনে করে যে সমাজ তার প্রথার মাধ্যমে আচার-বিচারের মাধ্যমে, বিধিনিষেধের মাধ্যমে ব্যক্তির জীবনে কল্যাণ সাধন করে ব্যক্তিকে সুরক্ষিত করে। কাজেই সমাজ ও সমাজশক্তি ব্যক্তির জীবনে অমঙ্গলজনক নয়। এবং সেইজন্য সেই ন্যায়পরায়ণ পবিত্র শক্তির প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন ব্যক্তিমাত্রেই কর্তব্য।

সমাজ শক্তি সম্পর্কে এই প্রকার ধারণা থেকেই দুরখাইমের মতে আদিম সমাজে মানুষের মনে ঈশ্বরের ধারণাটির উন্মেষ হয়, এবং সেই ধারণাটিকে হাতিয়ার রূপে ব্যবহার করে সমাজ ব্যক্তি-মানুষের আনুগত্য আদায় করে।

দুরখাইমের মতে মানুষ আসলে তার চারপাশের জগতে এক মঙ্গলজনক সমাজশক্তিকে উপলব্ধি করেই সেই

শক্তির আশ্রয় স্বরূপ ঈশ্বরের কল্পনা করে, এবং সমাজের নির্দেশকে ঈশ্বরের নির্দেশ রূপে গন্য করে সমাজের প্রতি সে তার আনুগত্য প্রকাশ করে অর্থাৎ ধর্মের ঈশ্বরকে একটি মাধ্যম বা হাতিয়ার রূপে ব্যবহার করে আদিবাসীদের গোষ্ঠীসমাজ সমাজভুক্ত ব্যক্তিদের আনুগত্য আদায় করে।

সেই কারনে দুরখেইম বলেছেন ঈশ্বর সমাজশক্তির প্রতীক মাত্র। সমাজশক্তির অতিরিক্ত ভাবে ঈশ্বরের কোন অস্তিত্ব নেই।

সমালোচনা :-

দুরখেইম ও অপরাপর ফরাসি সমাজতাত্ত্বিকদের অনুসরন করে এমন বলার মধ্যে কোন দোষ নেই যে বাস্তবিক পক্ষে ধর্ম এক সামাজিক ঘটনা এবং ধর্মের ঈশ্বর এক সামাজিক প্রত্যয়, তবে দুরখেইম এবং অপরাপর সমাজতাত্ত্বিকদের অনুসরন করে এমন বলা সঙ্গত হবে না যে ধর্ম ও ধর্মের ঈশ্বর একপ্রকার হাতিয়ার যা প্রয়োগ করে সমাজ তার ব্যক্তিবর্গকে নিয়ন্ত্রন করে।

ধর্ম এক সামাজিক ঘটনা এবং ঈশ্বর নিছক সমাজশক্তির প্রতীক দুরখেইমের এমন অভিমতের বিরুদ্ধে ধার্মীক ব্যক্তিরা কতগুলি অভিযোগ বা আপত্তি উত্থাপন করেছেন —

(1) ধর্মকে সমাজের বা সমাজশক্তির প্রতীক রূপে গন্য করলে সার্বিক ধর্মচেতনাকে ব্যাখ্যা করা যাবে না, কারন আদিম সমাজ ছিল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠী সমাজ, যেখানে এক সমাজের আসেপাশে অপরাপর গোষ্ঠীসমাজ ও-মিত্রভাবে বা শত্রুভাবে বিদ্যমান ছিল, এবং যেখানে এইসব সমাজের আচার আচরন এবং বিধিনিষেধের মধ্যে কোন সামনজস্য বা মিল ছিলনা, বিভিন্ন গোষ্ঠী সমাজের আচার বিচার ভিন্ন হওয়ায় সেইসব সমাজের মানুষদের মধ্যে সর্বদা ভাতৃত্বের বন্ধন ছিলনা, কিন্তু ধর্ম একমাত্র বিভিন্ন গোষ্ঠীসমাজে সম্প্রসারিত হওয়ায় এবং একেশ্বরের ধারনাটি উন্মেষিত হওয়ায়

বিভিন্ন গোষ্ঠীর মানুষের মধ্যে ভাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ করে। কারন এক্ষেত্রে বাদে একথাই বলা হয় প্রেমময় ঈশ্বরের কাছে সব সমাজের সব মানুষ সমান ভালোবাসার পাত্র এবং সেই জন্য মানুষ যদি তার সমাজের অন্যান্য মানুষকে ভালোবাসে তবে সেটাই হবে উত্তম ধর্ম, বা সর্বশ্রেষ্ঠ ঈশ্বর ভক্তি। এইভাবে সমাজ শক্তির পরিসর এবং ঈশ্বর শক্তির পরিসর অভিন্ন না হওয়ায় ধর্মের ঈশ্বরকে সমাজশক্তির প্রতীকরূপে গন্য করা যাবেনা।

(ii) দুরখেইমের সমাজতাত্ত্বিক ধর্মীয় ব্যাখ্যাটি গ্রহন করলে সামাজিক অগ্রগতি বা সমাজসংস্কারকে ব্যাখ্যা করা যাবেনা। সাধারনভাবে সমাজ এক রক্ষনশীল সংগঠন, সমাজে প্রচলিত আচারবিচার গুলি, ধ্যান-ধারনাগুলি সমাজের পক্ষে মূল্যবান, হিতকর, উপযোগী, এমন করে সমাজ তাদের রক্ষন করতে আগ্রহী থাকে, কিন্তু ধার্মীক ও নীতিনিষ্ঠ মহাপুরুষগন পরিবর্তনপন্থী। ধর্মের জগতে, নৈতিক জগতে পরিবর্তন সাধনের জন্য দেখা যায় যে এইসব ধর্মীয় মহাপুরুষগন সমাজের আচার-বিচারের বিরুদ্ধে এক্যবদ্ধ হয়েছেন এবং সমাজোত্ত মানুষ ও উন্নত ধর্মীয় ও নৈতিক জীবনলাভের জন্য প্রচলিত ধ্যান-ধারনার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়েছেন। এইভাবেই যুগে যুগে সমাজের সংস্কারসাধন ও অগ্রগতি সম্ভব, কাজেই দুরখেইমকে অনুসরন করে পরিবর্তন বিরোধী সমাজের সাথে পরিবর্তনকামী সমাজকে অভিন্ন মনে করা সঙ্গত হবেনা এবং এমন মনে করাও সঙ্গত হবেনা যে সমাজশক্তির প্রতীক হল ধর্মের ঈশ্বর।